পর্যবেক্ষণে ভোগবাদী সমাজ ও ঢাকার গ্রুপ থিয়েটার চর্চা

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নাট্যকলা বিকাশে রাজধানী ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রারম্ভকালের এই নাট্যকলা ইউরোপীয় বাস্তববাদের সর্বাত্মক ধারাকে অনুসরণ করেছে ঠিক। তবে আশির দশকের শেষ থেকে অপর কিছু নাট্যরীতির চর্চা দর্শক অভিজ্ঞতায় নয়া রূপে হাজির হতে শুরু করে। এই সময় থেকে ঢাকা'র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে স্থানীয় এবং ঐতিহ্যবাহী নাট্যকলার রীতি পদ্ধতি গ্রহণের প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা ক্রমান্বয়ে জোরালো এবং অপরিহার্য হয়ে উঠতে থাকে। সমন্বয়ের (সিনথিসিস) এই নাট্যচর্চা অতঃপর বাংলার শেকড়-সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য-অনুসারী নাট্যচর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমন্বয়ের নাট্যচিন্তা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় অজানা কিছু নয়। স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যের 'নাটগীত' রীতির জনপ্রিয়তা এবং এই রীতির সমন্বয়ে নির্মিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটি 'রঙ্গালয়ে' প্রবেশাধিকার বঞ্চিত সাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। নাটগীত রীতির 'কৃষ্ণযাত্রা' পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ড্রামাটিক থিয়েটার কাঠামোর (প্লট) সমন্বয়ে 'যাত্রা' আঙ্গিকে বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রাষ্ট্রীয় শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে মুকুন্দদাসের 'স্বদেশী যাত্রা' এবং রমেশ শীলের 'কবিগান' বাংলার গণমানুষদের উদ্বেলিত করেছিল। উপনিবেশিক সময়ের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষদিকের প্রায় সকল নাটকেই স্থানীয় নাট্যকলার সাথে ইউরোপীয় নাটকে নানাবিধ অনুষঙ্গের (প্লট, পরিবেশনারীতি) সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। 'নন্দিনী' আর 'অমল' তো নাটগীত-এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে করেন কেউ কেউ। তারা উভয়ে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় নিজেদের অস্তিত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে, যেমন করেছে বেহুলা, কৃষ্ণ ও ইমাম-হাসান হোসেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা ও ডাকঘরে'র ঠাকুরদা এবং অচলায়তনে'র দাদাঠাকুর যাত্রানুষ্ঠানের 'বিবেক' ও 'বাউল' চরিত্রদ্বয়ের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।'

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বাংলার নাট্যকলায় সেলিম আল দীনে'র প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত। বলা যায় তিনি-ই প্রথম নাট্যকার যিনি স্বাধীন বাংলার শহরায়তনিক নাট্যকলায় ঐতিহ্য-ঘনিষ্ট নাট্যের রীতি পদ্ধতি সমন্বয়ের ভাবনাকে রচনা ও প্রয়োগসূত্রে প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণে সফল হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়, এস এম সোলায়মান সমাজের অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ, কৌতুক, পরিহাস করার লক্ষ্যে মিউজিক্যাল স্যাটায়ার নিয়ে হাজির হলেন। লোক ঐতিহ্যের রীতি পদ্ধতির সাথে আধুনিক নাট্যকলার সমন্বয়ের এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল সৈয়দ জামিল আহমেদ-এর 'বিষাদ সিন্ধু'। মুকাভিনয় নামক একটি অভিনয় শৈলীর বিকাশও লক্ষ করা যাবে এই সময়ে। আবার এই সময় থেকেই ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা থেকে ফিরে আসা একদল নাট্য তরুণ অভিনয়কলাতেই শুধু নয়, অনুশীলন, নির্মাণ শৈলী ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রদর্শন প্রক্রিয়াতেও নতুন চিন্তার সমন্বয় করেছিলেন। ফলে ঢাকা'র নাট্যকলা দীর্ঘদিনের অভ্যস্থ সংলাপ নির্ভর বাস্তবানুগ নাট্যাক্রিয়া পরিবেশনের সমান্তরালে নৃত্য, গীত, গদ্য, কাব্য নির্ভর নাট্যরীতি'র অনুশীলন ও প্রদর্শনের অভিজ্ঞতায় মুখরিত হয়ে উঠতে থাকে। বৈচিত্র্যের এই নাট্যকলা একদিকে যেমন উপনিবেশকালে পরিপুষ্ট ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের অনুকরণে "আধুনিক বাংলা নাটকের" আধিপত্যকে মেনে নিয়েছিল। অন্যদিকে স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যের সাথে সমকালীন নগরায়তনিক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের মেলবন্ধনকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। আবার প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যশিক্ষা প্রসারের কারণে বিশ্বনাট্যের ধ্রুপদী থেকে সমকালীন– সকল প্রকার নাট্যরীতির পাশাপাশি শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতামূলক উন্নয়নের জন্য নাট্য এবং শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতিও বিকশিত হতে পেরেছিল। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে গ্রহণ আত্তীকরণের এক সমৃদ্ধ নাট্যকলা, যা গত শতকের পুরো সময়টা জুড়ে নাগরিক ভাব-চিত্তে বিচিত্র শিল্পরস আস্বাদনের খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি আজ একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এক নয়া ভোগবাদী বিশ্বায়ন বাস্তবতার সম্মুখীন। পণ্য, পুঁজি ও প্রযুক্তির সর্বাত্মক বিস্তার ঘটেছে দেশের প্রতিটি স্তরে। এই ভোগবাদের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে বাণিজ্য এবং আর্থিকসেবা প্রতিষ্ঠান, শপিংমল, বিজ্ঞাপন, বিনোদন প্রভৃতির মধ্যে। উৎপাদনমূলক পরিচিতি থেকে ভোগবাদে সরে আসার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের মেট্রোপলিটান সিটির অর্থনৈতিক সংস্কৃতিও দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের রঙিন পসরা, জীবন বীমা কোম্পানীর বিকাশ, শিক্ষা ও চিকিৎসার বাণিজ্যিক সেবা- বেসরকারী হাসপাতাল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের রমরমা ব্যবসা, শপিং-সেবার বাহারি মেলা- চেইন শপিং ও অনলাইন শপিং-এ ক্রেডিট, ডেবিট আর ডিসকাউন্টের তুমুল প্রতিযোগিতা, সকল দামী ব্র্যান্ডের শো-রুম সাথে আকর্ষণীয় সেলস্-কন্যাদের পণ্য-প্রদর্শন এবং সর্বোপরি কর্পোরেট দুনিয়ার 'স্মার্ট এক্সিকিউটিভ প্রজন্মে'র ভিড়ে বর্হিজগতকে স্বপ্নে দেখা সাদা-কালো ছবি বলে ভ্রম হয়। এরূপ বাস্তবতায় ক্ষমতা, জ্ঞান এবং উৎপাদন ব্যবস্থা নতুন এক সত্য ও সম্পর্কের বয়ান রচনা করে। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে 'জ্ঞানের চুড়ান্ত বিকাশ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সেই সত্য 'পরিণামে ক্ষমতাই উৎপাদন করে'। অর্থাৎ 'ক্ষমতা' ধারণার প্রথাগত 'শোষক-শোষিতে'র দ্বি-পাক্ষিক (বাইনারি) সম্পর্কসূত্রকে খারিজ করে দিয়ে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যায় উত্থাপন করে। ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, জাতি অথবা রাষ্ট্র প্রত্যেকেই একইসঙ্গে শোষক এবং শোষিত- অর্থাৎ প্রত্যেকেই ক্ষমতা'র একক যা পারস্পরিক স্বার্থ, সম্পর্ক ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে উপস্থিত হয়। তাই জীবনের কোনো গল্পই এখন আর প্রথাগত 'শুরু, মধ্য ও শেষ'- এরূপ কাঙ্ক্ষিত নাটকীয় পরিণতিতে পৌঁছায় না বরং আরও জটিল ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। এই বাস্তবতায় গ্রুপ থিয়েটারের বর্তমান সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা এবং এর অনুশীলন, নির্মাণ ও প্রদর্শন প্রক্রিয়া এই পরিবর্তিত নাগরিক সংস্কৃতির সাথে খুব সামান্যই সমন্বয় করতে পেরেছে বলে মনে হয়। অন্তত, নাট্যকলার বিস্তার ও জন-সংযুক্তির বিপরীতে নাট্যগৃহের সংখ্যা, নাটকের চর্চা ও প্রদর্শন ব্যবস্থাপনা এবং দর্শকের শ্রেণি এবং উপস্থিতি সংখ্যা বিবেচনায় এই মন্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না।

বলা হয়ে থাকে, স্বাধীনতাত্তোর বাংলার সর্বাধিক বিকশিত শিল্প মাধ্যম হলো নাট্যকলা। নাট্যকলার এই অর্জনকে অধিক সুসংহত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন'। প্রাথমিক অবস্থায় ঢাকাস্থ দলগুলোকে সংযুক্ত করে নাট্যের চর্চা, নির্মাণ ও প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানকল্পে এবং প্রয়োজনীয় দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনার সংকল্প নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন যাত্রা শুরু করে (অচিরেই সমগ্র বাংলাদেশ এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়)। ঢাকা শহরে পর্যাপ্ত থিয়েটার হল না থাকায় সদস্য দলগুলোকে একটি গ্রহণযোগ্য ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাট্য-প্রদর্শনীর সুযোগ করে দেওয়া এবং নাট্য উৎসবসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সহযোগিতা করার মহান দায়িত্বটিও গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের ওপর বর্তায়। অথচ নাট্যদলের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেলেও কিংবা এই শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার উল্লম্ফন দ্বিগুণ তিনগুণ হারে বর্ধিত হলেও নাট্যগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। বস্তুত এই মেগাসিটিতে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত মঞ্চ মাত্র চারটি, যার তিনটি শিল্পকলা একাডেমিতে এবং অপরটি মহিলা সমিতি মিলনায়তন।

বলতে দ্বিধা নেই যে, চারটি প্রেক্ষাগৃহ নির্ভরতায় চলমান গ্রুপ থিয়েটার চর্চা ক্রমবর্ধমান এবং অধিক জনবহুল এই ঢাকা শহরের দর্শক চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রায় ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। শিল্পকলা একাডেমি নির্ভর গ্রুপ থিয়েটারের সাংগঠনিক কার্যক্রম, নাট্য প্রদর্শনী এবং দর্শক উপস্থিতির সাধারণ পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষণ ও আলাপচারিতা থেকে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়- একাডেমির তিনটি মঞ্চে (স্টুডিও থিয়েটার, পরীক্ষণ থিয়েটার হল ও প্রধান নাট্যশালা) দর্শকের দৈনিক গড় উপস্থিতি অনধিক ৪০০ (১০০+১০০+২০০) জন। দু/একটি বিশেষ নাট্য উৎসব অথবা দু/একটি প্রযোজনায় দর্শকের অধিক উপস্থিতি এই গড় হিসেবে বড় ধরণের তারতম্য করবে না বলে মনেকরি। এমনকি নেতৃস্থানীয় কিছু নাট্যদলের অনুসারী দর্শক-গোষ্ঠী বা বিশেষ দর্শক-গুচ্ছের অস্তিত্ব যা নব্বই দশকেও হলমুখী ছিল, বর্তমানে তা অনেকটাই হল বিমুখ। ফলে, এই দর্শক স্বল্পতার প্রাথমিক অভিঘাতটি এসে পড়ে দলীয় কার্যক্রমের ওপর। অধিকাংশ দলের ক্ষেত্রেই টিকিটের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা নাটকের প্রদর্শন ব্যয় (প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া, অতিরিক্ত লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া, সেট বহন, মেকাপ প্রচার ও প্রকাশনা ব্যয়) এবং নুন্যতম আপ্যানসহ মোট ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে এই বিষয়টি একটি মেনে নেওয়া নিদারুণ বাস্তবতা। বর্তমানে মাসে ১টি নাট্য প্রদর্শনীর ব্যায় সংস্থান করাই অধিকাংশ দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দর্শক স্বল্পতা এতটাই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, কিছু দল সাপ্তাহিক ছুটি বা ক্যালেন্ডার নির্দেশিত ছুটি ব্যতিত অন্যান্য কর্মদিবসে নাটক প্রদর্শনীতে উৎসাহিত হয় না। নিশ্চিতভাবেই মেগাসিটি ঢাকা'র নাট্যগৃহের মোট সংখ্যা এবং দর্শক উপস্থিতির এই হাল কিছুতেই আশাজাগানিয়া নাট্যকলার চিত্র তুলে ধরে না। বরং দর্শক বিচ্ছিন্ন এই নাট্যকলা বর্তমানে এক চরম হতাশার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। হতাশার এই চিত্র আরো স্পষ্ট হয় যখন নিয়মিত অ-নিয়মিত নাট্যদলের সংখ্যা-তারতম্য দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে। জানুয়ারি ২০০০ থেকে নভেম্বর ২০০১-এ পরিচালিত একটি জরিপ অনুযায়ী ঢাকা'র গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনভুক্ত নাট্যদলের নথিভুক্ত সংখ্যা ছিল ৬৫টি, যার মধ্যে নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনে সক্ষম এমন দল ছিল অনধিক ৪০টি। দুঃখজনক হলো এই যে, ২০২৪ সালের পর্যবেক্ষণে অনিয়মিত নাট্যদলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এমন কি, মঞ্চনাটকে নেতৃত্বদানকারী কিছু দলও এই অনিয়মিতদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। দলগুলো আজ নিয়মিত (প্রতিমাসে একটি) নাট্য প্রদর্শনী এবং নুন্যতম দুই বছরে একটি নতুন নাটক নির্মাণের সাধারণ সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। আর এই ক্ষেত্রে একটি সরল অভিযোগ হচ্ছে এরকম যে- পেশাগত কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাট্যকর্মী অনিয়মিত হয়ে পড়ায় নিয়মিত প্রদর্শনের সক্ষমতা হারিয়ে দলগুলো ক্রমান্বয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে।

এই প্রসঙ্গে ২০০৫-২০২৪ সময়সীমায় গ্রুপ থিয়েটারের সাংগঠনিক তৎপরতায় কী কী গুণগত পরিবর্তন এসেছে তারও একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা যেতে পারে। তবে এর পূর্বে, এক নজরে ১৯৭২-২০০৫ পর্যন্ত নাট্যদলের সাংগঠনিক তৎপরতার সাধারণ প্রবণতার দিকে তাকানো যাক। এই সময়ে গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাগুলোর মধ্যে ছিলো- দলের নিজস্ব, ভাড়াকৃত অথবা অনুরোধের ভিত্তিতে প্রাপ্ত একটি মহড়া কক্ষ পরিচালনা করা। এমনকি স্টুডিও থিয়েটার চর্চার প্রচেষ্টাও ২০১০ অবধি লক্ষ করা গিয়েছিল (যদিও বর্তমানে একটি স্টুডিও সচল রয়েছে)। দলীয় কক্ষে সপ্তাহে কমপক্ষে ৩/৪দিন বাধ্যতামূলক হাজিরা দেওয়া। নাট্যপ্রদর্শনীর নির্ধারিত তারিখ সামনে রেখে কমপক্ষে এক সপ্তাহ রিহার্সাল করা। নতুন নাটক নির্মাণে টানা দুই থেকে আড়াই মাস মহড়ার সময় ও সূচি অনুসরণ করা। সাহিত্য বা নাট্য বিষয়ক পাঠচক্রের আয়োজন করা। অভিনেতার দক্ষতা উন্নয়নে দলে বছরে নুন্যতম দুটি নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা। কল-শো, উৎসব, সভা ও সেমিনারের আয়োজন বা অংশগ্রহণ করা। দলীয় উদ্দ্যোগে বাৎসরিক কর্মী সম্মেলন আয়োজন করা প্রভৃতি। এ সকল কার্যক্রম কতক ক্ষেত্রে আন্ত:দলীয় সম্পর্কের পাশাপাশি স্থানিক পরিমণ্ডলে ক্রিয়াশীল অপরাপর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং জনদেরও সম্পৃক্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে দুটি মঞ্চ যুক্ত জাতীয় নাট্যশালা'র প্রতিষ্ঠা (পরবর্তীতে স্টুডিও থিয়েটার যুক্ত হয়) এবং ভাড়া ও বরাদ্দসূত্রে মহড়া কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা অর্জনের কল্যানে অচিরেই গ্রুপ থিয়েটারের এতদিনের অভ্যস্থ সাংগঠনিক তৎপরতা ও কর্ম-কৌশলগুলো তড়তড় করে পাল্টে যেতে থাকলো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরিবর্তনের প্রাথমিক ধাক্কাটি এসে পড়লো গ্রুপ থিয়েটারের সাংগঠনিক অফিস/মহড়া কক্ষ পরিচালনাতে। নিজস্ব অফিস/মহড়া কক্ষ বা স্টুডিও পরিচালনার প্রবণতা টেনেটুনে নতুন শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত দেখা গেলেও বর্তমানে দু-একটি নাট্যদল ব্যতিত এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে গ্রুপ থিয়েটারচর্চা শিল্পকলা একাডেমিতে ভাড়া ও বরাদ্দকৃত মহড়া কক্ষ নির্ভর- প্রতিমাসে সর্বাধিক ৩/৪দিন কেবল নাট্যপ্রদর্শনীর অনুমতি প্রাপ্তির সাপেক্ষে পরিচালিত হয়ে থাকে। নতুন নাটকের মহড়া, কারিগরি এবং উদ্বোধনী মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও দলগুলো শিল্পকলার উপর নির্ভরশীল। খুব কম সংখ্যক নাট্যদল রয়েছে যারা

বর্তমানে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত নাট্য শিক্ষা কার্যক্রম/ওয়ার্কশপ পরিচালনাকে গুরুত্বপূর্ণ/প্রয়োজনীয় মনে করে (কয়েকটি দলের পরিচালিত নাট্যশিক্ষার স্কুল এই হিসেবের অন্তর্গত নয়)। আমন্ত্রণ বা 'কল-শো' এর ভিত্তিতে ঢাকা ও জেলা শহরের মধ্যে নাট্যচর্চা ও প্রদর্শনী বিনিময়ের যে প্রথা গত শতকের শেষাবধি পর্যন্তও উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ করা গেছে, বর্তমানে তা বিরল ও বিশেষ।

বস্তুত, এ হলো একবিংশ শতকের ঢাকাস্থ গ্রুপ থিয়েটার চর্চার সার্বিক হালচিত্র, যা অতিমাত্রায় শিল্পকলা একাডেমি নির্ভরশীল এবং অভ্যস্থ। কেবল মাসিক ভিত্তিতে মাত্র ১টি নাট্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা এবং দলের সুবিধা ও সক্ষমতা অনুযায়ী দুই/তিন বছরে একটি নতুন নাটক মঞ্চায়নে সীমিত হয়ে পড়েছে। দৃশ্যমান এই সাংগঠনিক তৎপরতার প্রায় সবটুকুই আজ শিল্পকলা একাডেমির অনন্য নিরাপদ ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভশীল। এই নির্ভরশিলতা নাট্য দলগুলোর জন্য স্বস্তি এনে দিলেও কার্যত শহরের বিশাল জনগোষ্ঠীকেই করেছে বিচ্ছিন্ন। সঙ্গত কারণে নাট্যচর্চার এইরূপ গণ্ডিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও উদ্রেক করে– এক. মাসিক ভিত্তিতে একটি প্রদর্শন এবং সর্বসাকুল্যে প্রদর্শন কেন্দ্রিক সাংগঠনিক ব্যাবস্থাপনায় একইসাথে দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শিল্পী প্রজন্ম বা সম্প্রদায় গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কতটুকু বা আদৌ সম্ভব কি? দুই. পুঁজি, প্রযুক্তি ও সেবা নির্ভর নিত্য নতুন নাগরিক-সাংস্কৃতিক চাহিদা ও ভোগবাদী পেশা প্রত্যাশা'র বিপরীতে গ্রুপ থিয়েটারের সান্ধ্যকালীন অপেশাদার নাট্যচর্চার উপযোগিতা এবং কার্যকরিতা কোথায় ও কতটুকু? এবং তিন. সর্বাত্মক রূপে একটি আঙ্গিনায় আবদ্ধ ও প্রথাগত নাট্যানুশীলনে আস্থাশীল থেকে বিচিত্র সংস্কৃতিজনদের এই ঢাকা শহরের দর্শক শ্রেণি ও সংখ্যায় আশানুরূপ কোনো পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব কি?

বক্ষমাণ আলোচনায় গ্রুপ থিয়েটারের সান্ধ্যকালীন সৌখিন নাট্যকলার প্রায়োগিক অভ্যস্থতা এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে যা কিছু ধারণা পাওয়া গেল, তা আশাব্যঞ্জক নয় কিছুতেই, বরং এই পর্যবেক্ষণ পরিণামে এক গভীর হতাশা আর আশঙ্কার জন্ম দেয়। কেননা, যে নাট্যকলা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সর্বাধিক বিকশিত ও সামাজিক গ্রহণযোগ্য একটি শিল্প হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সেই নাট্যকলা আজ দুটি গৃহাঙ্গণে (শিল্পকলা ও মহিলা সমিতি) আবদ্ধ– অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, গতানুগতিক এবং বিচ্ছিন্ন এক শিল্প মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। 'একনিষ্ঠ', 'ত্যাগী' ও 'দক্ষ' নাট্যকর্মী অনেকের চোখেই আজ নট নাট্য নাটকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আর উপযোগিতার যুক্তি ভীষণ রকম দুর্বল ধুসর আর দিশাহীন হয়ে পড়েছে। বহু তরুণ-স্বপ্ন আজ ৯টা-৫টা'র (কার্যত ৯টা-৯টা) কর্পোরেট যাঁতাকলে পড়ে সৃজনানন্দকে বিসর্জন দিয়ে কেবল হাজিরায় অভ্যস্থ থাকাতেই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছেন। অথচ, এমন যদি হতো যে– এক. শিল্পকলা একাডেমি নির্ভরতা বর্তমান গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় অনিবার্য ও নিরাপদ বিকল্প– এটি আজ বাস্তবতা। তাই, এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি যদি উদ্দ্যোগী হতো একটি সার্বক্ষণিক নাট্যচর্চার "পেশা ভিত্তিক পরিবেশ" তৈরি করার, তবে তো এই নাট্য পরিবেশেই বহু 'ত্যাগী' 'একনিষ্ঠ' ও 'দক্ষ' কর্মী/কুশলী/শিল্পী/বিশেষজ্ঞগণ সংযুক্ত হয়ে নাগরিক সংস্কৃতির বহুমাত্রিক চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নয়া উদ্দ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো। দুই. একটি সর্বাত্মক সংস্কারমূলক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন' যদি এক-কেন্দ্রিকতার বিপরীতে বহু-কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার প্রকল্প গ্রহণ করতে পারতো, তবে-ই হয়তো রাজধানী'র নাট্যচর্চার বিকাশ ও বিস্তারে নয়া সম্ভাবনা তৈরি হতে পারতো। সম্ভবত এর ফলে মঞ্চনাটকে গণ-সম্পৃক্ততা, গ্রহণযোগ্যতা এবং সাধারণ জনগণ বা কমিউনিটি'র অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পথটিও প্রশস্ত করতে পরতো। এবং তিন. কেবল সদস্য দলগুলোই নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক, যৌথ বা ঐক্যমতের থিয়েটার (রেপার্টরী নামে), সংস্থা বা উদ্যোগতা নির্ভর থিয়েটার চর্চা, স্টুডিও থিয়েটার প্রভৃতি সকল নাট্য প্রচেষ্টাকে যদি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সাংগঠনিক বলয়ে গ্রহণ করা যেতো, তবে হয়তো গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন নতুন সাংগঠনিক শক্তি, সক্ষমতা ও সামর্থের নবায়ন ঘটিয়ে সংকুচিত ও আবদ্ধ নাট্যকলার মুক্তিতে নতুন প্রবাহের সঞ্চার ঘটাতে পারতো।

ধন্যবাদ।
সাইদুর রহমান লিপন
শিক্ষক, গবেষক ও নির্দেশক